‘‘ভারতের ঝুমঝুমি’’ গড়ানের দিক

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একের - ভেতরে-দুই গল্প’ তিন ধরনের হতে পারে
কাঠামো গল্প গৌণ, মূল কাহিনী মুখ্য কাঠামো গল্পই মুখ্য, মূল কাহিনী গৌণ, কাঠামো গল্প ও মূল কাহিনী দুই-ই মুখ্য, অন্তত কোনোটিই অন্যর তুলনায় গৌণ নয়। কাঠামো গল্প আর মূল কাহিনী দুই-ই গৌণ হলে সে-গল্প আর পড়ার যোগ্য হয় না। সুতরাং এমন একটা যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা থাকলেও সেই ধারণাটিকে আলোচনার বাইরে রাখা যায়। পরশুরামের ‘‘ভরতের ঝুমঝুমি’’ হলো তৃতীয় ধরণের গল্প। এর বিশেষত্ব এই যে, কাঠামো গল্পর সঙ্গে ভেতরের কাহিনীটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম হৃষীকেশ তীর্থে এক ধর্মশালায় খেতে বসেছেন কাঠামো গল্পর লেখক, ‘আমি’, তাঁর মামাতো ভাই পুলিন, তাঁর দশ বছরের ছেলে পল্টু, আর চাকর টহলরাম। সেখানে হঠাৎ এক বুড়ো সাধুবাবা এসে হাজির। তিনি যে-সে লোক নন, সাক্ষাৎ মহামুনি দুর্বাসা। এখন অবশ্য তাঁর আর তেমন তেজ নেই। দুর্বাসা তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ভরতকে দেওয়ার জন্যে তার দিদিমা, অপ্সরা মেনকা দুর্বাসাকে একটি ঝুমঝুমি দিয়েছিলেন। ভরতের কাছে গিয়ে দুর্বাসা দেখলেন সে - ঝুমঝুমি তাঁর ট্যাঁকে নেই। আতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও সেটি পাওয়া গেল না। এমন সময়ে পল্টুর পোষা চারটি সাদা ইঁদুর দুর্বাসাকে আক্রমণ করল। তার মধ্যে একটা আবার সেঁধিয়েছিল দুর্বাসার দাড়িতে। সেই দাড়ির গিঁট কুলে ঝুমঝুমিটি পাওয়া গেল।

এরপর আসে আসল সমস্যা এই ঝুমঝুমি এখন কাকে দেওয়া হবে। ভারতের বংশ তো কবে লোপ পেয়েছে; যাঁরা তঁার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁরাও ফৌত হয়েছেন। তার বদলে এখন তৈরি হয়েছে দুটি আলাদা রাষ্ট্র, ভারতীয় গণরাজ্য আর ইসলামীয় পাকিস্তান। একজনকে ঐ ঝুমঝুমি দিলে অন্যজন চটে যাবে। ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে দুর্বাসা ঠিক করলেন ঝুমঝুমিটা ভেঙে দুই রাজ্যের রাষ্ট্রপতিকে দেবেন।

গল্পটির গড়ন এই রকম (ক) কাঠামো গল্প - (খ) ভেতরের গল্প (গ) কাঠামো গল্প। এই ছকটি অন্যান্য একের - ভেতরে - দুই গল্পেও থাকে; শুধু পরশুরামের গল্পে নয়, অন্যদের গল্পেও। কিন্তু ‘‘ভরতের ঝুমঝুমি’’-র বিশেষত্ব হলো কাঠামো গল্পে ফিরেই ব্যাপারটা শেষ হয় না; গল্পর ভেতরে-গল্প-র মতো গল্প-র পরেও একটা গল্প থাকে। সেটি হলো ঃ ঝুমঝুমিটি এখন কে পাবে? যদি ঝুমঝুমি ফিরে পাওয়াতেই গল্পটি শেষ হয়ে যেত, তাতেও কোনো ক্ষতি ছিল না। হারানো জিনিস বহুকাল পরে হঠাৎই ফিরে পাওয়ার একচমৎকার নমুনা হিসেবে গল্পটি কম মজাদার হতো না। কিন্তু তাহলে বাদ পড়ত ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও তার পরে পরিস্থিতি। তাই কাঠামো গল্পর শেষে এমন একটি পরিশিষ্ট যোগ করতে হয়। তাতে পাঠকের কৌতূহলও মেটে, আর দেশভাগের পর দুটি নতুন রাষ্ট্ররসম্পর্ক কেমন মধুর ছিল সে - বিষয়েও কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়।

পরশুরাম সাধারণত নিটোল সমাপ্তিই পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাকে জোড়া সমাপ্তি বা ‘ডবল ক্লোজার’ বলা যেতে পারে।৩ এমন আর - একটি গল্প হলো ‘‘যদু ডাক্তারের পেশেন্ট’’।

আরও কয়েকটি দিক থেকে ‘‘ভরতের ঝুমঝুমি’’ অনন্য। সাধারণত একের - ভেতরে - দুই গল্প-য় সময়ের মাত্রা হয় দু-রকমের। কাঠামো গল্পটি থাকে বর্তমানকালে আর ভেতরের গল্প অতীতকালে। এ গল্পে অতীত বলতে দ্বাপর ত্রেতা

পেরিয়ে খাস সত্য যুগে পৌঁছে যেতে হয়। লোকবিশ্বাসে সাতজন চিরঞ্জীব মানুষের কথা জানা যায়। দেবতা না হয়েও তঁারা অমর হয়ে আছেন। এই সাতজন হলেন অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপাচার্য আর পরশুরাম (এঁদের নিয়ে পরশুরাম একটি গল্প লিখেছিলেন, ''গন্ধমাদন - বৈঠক'')। এই সাতজনের বাইরেও দুর্বাসা বা তাঁর মতো আরো কিছু মহামুনি চিরজীবী হয়ে আছেন -- পরশুরামের গল্প থেকেই তা জানা যায়। তাঁরা শুধু কি চিরজীবী? কালের ফেরে দুর্বাসাকে হিন্দী ও বাঙলাও শিখতে হয়েছে; গাঁজা খেলে বাতিক বৃদ্ধি হয় বলে সিগারেট ধরতে হয়েছে (অন্তত কেউ অফার করলে 'না' বলেন না)।

দুর্বাসার দুঃখের কাহিনী শেষ হয় খুবই আচমকা। পল্টুর চারটি সাদা ইঁদুর তাঁকে রীতিমতো পেড়ে ফেলে। মহাতেজা উগ্রতপা ঋষির পক্ষে তা আদৌ গৌরবের নয়। গল্পর প্রথম অনুচ্ছেদেই সাদা ইঁদুরের কথা আছে। কেন সেই ইঁদুরগুলোকে আনা হয়েছে, দিনের বেলায় তারা কোথায় থাকে- সে-খবরও দেওয়া আছে। পড়লে প্রথমে মনে হয় এটি নিতান্তই মজাদার কিন্তু তুচ্ছ ব্যাপার, ডিটেল -এর কাজ। কিন্তু গল্পে তারা যে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা নেবে তা আঁচ করার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা ছিল না।
দেখবার বিষয় হলো দুর্বাসার মুখ দিয়েই গল্পকার পরশুরাম তাঁকে নিতান্ত খেলো করে তোলেন। মুখে মেনকাকে প্রথমে তিনি যতই অবজ্ঞা করুন, এই অপ্সরাকে দেখে তাঁরও যথেষ্ট কামনার ভাব জাগে। তবে সে - কামনাকে তিনি বর দেওয়ার মোড়কে প্রকাশ করেন ''যদি চাও তো আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটি পুত্র দিতে পারি। যদি তিন -চারটি বা শখানেক চাও তাও দিতে পারি।'' মেনকা অবশ্য নাক সিটকে সে-প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন, আর আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে দুর্বাসাকে বলতে হয় ''আচ্ছা আচ্ছা, না চাও তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি অপাত্রে দান করি না।'' মেনকা যদি অপাত্রই হন তবে বর দেওয়ার এমন অভিলাষ তাঁর হয়েছিল কেন?

এর থেকে বোঝা যায় ''ভরতের ঝুমঝুমি'' শুধু ''ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য'' নয়; মুনিঋষিদের নিয়ে পরশুরাম যেভাবে চিরদিন ঠাট্টা ইয়ারকি করে গেছেন, এখানেও তা-ই করেছেন। অর্থাৎ গল্পটিতে ব্যঙ্গর দুটি স্তর আছে। প্রথমটি মুনিঋষিদের সম্পর্কে প্রচলিত শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক পরিস্থিতি (ক্ষমতা হস্তান্তর পর সম্পদের ভাগ - বাঁটোয়ারা) নিয়ে।

পরশুরামের একের - ভেতরে -দুই গল্পর আরও একটি দিক হলো ভেতরের গল্পটি অবাধে চলতে পারে না; শ্রোতারা মাঝে মধ্যে বেয়াড়া প্রশ্ন তোলেন বা ফুট কাটেন। বংশলোচন গল্পমালায় চাটুজ্যেমশায় তাতে চটে যেতেন। কিন্তু ''ভরতের ঝুমঝুমি''-র দুর্বাসা তাতে রাগ করলেও ''যা- আমি আর বলব না'' -এমন ভয় দেখান না। উল্টে আপাত নিরীহ প্রশ্নর কড়া জবাব দিতে গল্প চালিয়ে যান। গোড়া থেকেই দেখানো হয়েছে তিনি অত্যন্ত দুর্মুখ, রাষ্ট্রভাষায় অশ্রাব্য অবাচ্য অলেখ্য গালাগালি করতে পারেন। গল্পর 'আমি' আর পুলিনকে তিনি পাষণ্ড নাস্তিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। গল্পর 'আমি' আর পুলিনকে তিন পাষণ্ড নাস্তিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। গল্পকার আবার জানিয়ে দেন তাঁদের চাকর টহলরাম ''বাঙালীর সংসর্গে থেকে একটু নাস্তিক হয়ে পড়েছে, অচেনা সাধুবাবাদেরওপর তেমন ভক্তি নেই।'' এখানে 'একটু' আর 'অচেনা' শব্দদুটি খেয়াল করার মতো।

এই নাস্তিকরা যে দুর্বাসার পক্ষে অনুকূল শ্রোতা হবেন না-- এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্বাসার সঙ্গে তাঁদের প্রশ্ন - উত্তরের ধরণটিও দেখার মতো। পুলিন একবার জিগেস করলেন ''আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ?'' পুলিনই আবার জিগেস করেন ''প্রভু, মেনকার বয়স কত?'' দুর্বাসার উত্তরটি অসাধারণ ''তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। অস্পরার আবার বয়স কি? জ্যোৎস্না বিদ্যুৎ রামধনু- এসবের বয়স আছে নাকি?''

প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রমে যাওয়ার আগে দুর্বাসা নিকটস্থ বন থেকে একটি সুপুষ্ট ওল আর সের খানিক বড় বড়

তিন্তিড়ি সংগ্রহ করে ঝুলির ভেতরে নেন। এইখানে আবার গল্পে বাধা পড়ে। অবাক হয়ে পুলিন বলেন "একমাসের খোকা বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল খাবে"৫ দুর্বাসা কিছু বলার আগেই লেখক 'আমি' বলে ওঠেন "তা আর না খাবে কেন। সেকালের ক্ষত্রিয় খোকারা পাথর হজম করত। বিলিতী গুঁড়ো দুধের তোয়াক্কা রাখত না।"

এ হলো বলার মধ্যে দুবার বাধা। দুর্বাসা অবশ্য তাতে দমেন না। তিনি ধমকে বলেন "তোমরা অত্যন্ত মুর্খ। ওল আর তেঁতুল ছেলে কেন খাবে, আশ্রমবাসী তপস্বী আর তপস্বিনীরা সবাই খাবেন। তার পর শোনো।"

এ গল্পের 'আমি' ও পুলিন, বোধহয় পাষণ্ড নাস্তিক বলেই, দুর্বাসার গল্পর মধ্যে বাধা দিয়ে আনন্দ পান। দোষটা অবশ্য দুর্বাসারই। কেতাঁকে বলেছিল ঝুমঝুমি হারানোর কথা শুনে দুজন বুড়ি তপস্বিনী তাঁকে কী শুনিয়েছিলেন সে-কথা জানতে? এক বুড়ি বলেছিলেন "তুমি ভারি অলবড্যে মুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় (ঝুমঝুমি) তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও এখন রাজ্যের ই কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখ গে।"৬ অন্য বুড়ি আবার তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন "কি বলছ গা দিদি! শুধু ই কাতলা কেন মিরগেল চিতল বোয়াল কালবোস শোল শাল চাঁই এসব মাছের পেটেও থাকতে পারে।" মাছের এই নামাবলিশুনে দুর্বাসার শ্রোতারা আর চুপ করে থাকেন কী করে? পুলিন বলেন "কচ্ছপের পেটেও যেতে পারে।" আর 'আমি' তো নদী ছেড়ে একেবারে সমুদ্রে গিয়ে পড়েন "হাঙর কুমির শুশুক সিন্দুঘোটক বা জলহস্তীর পেটে যেতেও বাধা নেই।" এর উত্তরে দুর্বাসা আর কোনো কড়া কথা বলেন না; 'একবার কটমট করে' তাকিয়ে আবার তাঁর গল্পে ফিরে যান।

পরশুরামের গল্পের 'আমি' সাধারণত একটু শান্ত শিষ্ট ধরনের লোক হন। "অত্রুরসংবাদ", "নিরামিষাশী বাঘ" ইত্যাদির কথা মনে কন। তবে ফিচেল আমি'-রও অভাব নেই। "কচি-সংসদ "-এর 'আমি'-র মতো এই গল্পর "আমি'-ও ভালোই মশকরা করেন। বিশেষ করে দুর্বাসাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তিনি যে দুটি পরামর্শ দেন -- হয় ধর্মজীবন যাপন, নয়তো জীবনস্মৃতি রচনা -- তাতে তাঁর ফিচলেমি বেশ ভালোভাবেই ধরা পড়ে।

পরশুরাম প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন
গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও কথ্যভাষায় হাস্যরস। নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা।৭

কথাটা মানতে একটু অসুবিধে আছে। সাধু বা চলতি-যে কোড-এই লিখুন, তার মধ্যে পরশুরামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্বদাই উজ্জ্বল। 'রামায়ণ' 'মহাভারত' -এর সারানুবাদ করার সময়ে তিনি উঁচু রীতির একটি চলিত কোড উদ্ভাবন করেছিলেন। তার মূল লক্ষণ হলোক্রিয়াপদ সর্বনাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে চলিত কোড-এর রূপ বহাল থাকবে, কিন্তু তৎসম শব্দও থাকবে প্রচুর। সেই কারণেই তাকে কথ্যভাষা বলা যায় না। মুখের কথায় অত অত তৎসম শব্দ অন্তত বিশ শতকে কেউ ব্যবহার করেন নি; উনিশ শতকেও শুধু কিছু ব্রাহ্মণপণ্ডিতই করতেন।৮ সারানুবাদের ভাষারীতিকেই পরশুরাম নিয়ে এলেন তাঁর গল্পে। "তৃতীয়দ্যূতসভা" ও "বালখিল্যগণের উৎপত্তি"গল্পে তার চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায়। অন্যান্য - পৌরাণিক গল্পে পরশুরাম আর সেই মাত্রায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু যেখানে তা করেন তা অতি মোক্ষম। যেমন, দুর্বাসাকে পুলিন বলেন "কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে।"৯ এখানে এক 'বিচরণ' -এই মাত হয়ে যেতে হয়। দুর্বাসা সর্বক্ষণ লৌকিক বাঙলায় কথা বলেন। কিন্তু অন্তত একবার তাঁর ভাষাও একটু ওপরে উঠে যায় "যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে সত্বর দায়মুক্ত হয়ে (আমি) ব্রহ্মলোকে যেতে চাই।" শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করার সময়ে তিনি উঁচু রীতিরই আশ্রয় নেন।

এ গল্পে তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা মেয়েলি ভাষা। মেনকা তো আছেনই, দুর্বাসাকে তিনি 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলেন। দুর্বাসা তাঁর কাছে নেহাতই এক "নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় (শকুন্তলাকে) শাপ দিয়ে ফেলেছে।" আর আছেন দুই বুড়ি তপস্বিনী। তাঁরা মেনকারই দোসর; দুর্বাসাকে তাঁরাও তাচ্ছিল্য করে 'তুমি'-ই বলেন।

শকুন্তলার কথা পরশুরামের অন্য গল্পেও এসেছে ("কর্দমমেখলা")। তবে সে হলো শিশু শকুন্তলা; কণ্বমুনির আশ্রমে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদার সঙ্গে সে বড় হয়েছে। "কর্দমমেখলা" এক অসাধারণ গল্প। সেখানেও বিশ্বামিত্র-কে নাকাল করে অপ্সরা মেনকা। দুটি গল্প পাশাপাশি রেখে পড়লে বাড়তি মজা পাওয়া যায়। দুটি গল্পেই ঋষিকে নিয়ে জমাট ঠাট্টা করা হয়েছে। আর দুজনেই নাকাল হন মেনকার হাতে। এদিক দিয়ে দেখলে "ভারতের ঝুমঝুমি"-কে "কর্দমমেখলা"-র উত্তরকাণ্ড বলে ধরা যায়, যদিও "কর্দমমেখলা" লেখা হয়েছিল পরে।।

বোধহয় 'রামায়ণ' - 'মহাভারত' সারানুবাদের সূত্রেই পুরাণকথার নানা চরিত্র সম্পর্কে পরশুরামের ভালোরকম পরিচয় হয়েছিল। নিজের মায়ের নাম অনসূয়া --এ কথা মনে করেই নাকি অনসূয়ার অনুরোধে দুর্বাসা শকুন্তলাকে দেওয়া শাপ হালকা করে দিয়েছিলেন। মহাদেব মেনকাকে স্নেহ করেন কেন? কারণ তাঁর শাশুড়ির নাম আর ঐ অপ্সরার নাম এক। কিন্তু এসবই ছোটোখাটো ব্যাপার। "ভরতের ঝুমঝুমি" -তে পরিস্থিতির মজা আছে, চরিত্র সৃষ্টির মজা আছে, আর আছে ঝকঝকে সংলাপ। "হনুমানের স্বপ্ন"-র পরে পরশুরামের ক্ষমতা যে এতটুকু কমে নি তার সেরা নমুনা "ভরতের ঝুমঝুমি" -তেই পাওয়া যায়।

।।টীকা।।
একের ভেতরে দুই গল্প - ভেতরে গল্প, স্টোরি উইদিন এ স্টোরি ও বলে। যাঁদের সুযোগ আছে তাঁরা ইন্টারনেটে এ http://en.wikipedia.org/wiki/story@story ওয়েব সাইটটি দেখতে পারেন। কাঠামো গল্প শুধু গৌণ নয়, একেবারেই নগণ্য হতে পারে মূল কাহিনীটি বলার উপলক্ষ্য জোগানো তার একমাত্র কাজ সেখানে না থাকে চরিত্রদের নাম -ধাম, না কোনো বিশেষত্ব। গী দ্য মোপাস-র 'ফ্লোরেন্টাইন" গল্পটি শু হয় এইভাবে আমরা মেয়েদের নিয়ে কথা বলছিলুম, কারণ পুষদের মধ্যে আর কী নিয়ে কথা বলার থাকে। আমাদের মধ্যে একজন বলল "দাঁড়াও! এ ব্যাপারে আমার একটা আশর্চ্য গল্প মনে পড়ছে।" আর সেটি সে বলল "
ক্লোজার ও তার নানান ধরণ নিয়ে জানার জন্যে মার্ফিন ও রায়, হথর্ন ইত্যাদি দ্র.। তবে ডবল ক্লোজার-এর কথা এঁরা বলেন নি; আর কেউ বলেছেন বলেও জানা নেই। প্রমথনামথ বিশী, 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী'-র ভূমিকা, ১ ৩৭। বাহুল্য হলেও বলি, এই দুটি খাদ্যবস্তু বেছে নেওয়ার পেছনে একটি পুরনো বাঙলা প্রবাদ কাজ করেছে যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। এর মানে হলো যেমন কঠিন রোগ, তেমনি তার চিকিৎসা। তু যেমন কুকুর তেমমি মুগুর। 'মহাভারত' -এর দুষ্মন্ত - শকুন্তলা উপাখ্যান আমূল পাল্টে কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্' নাটকটি লিখেছিলেন। তাতেই মাছের পেটে শকুন্তলার আংটি চলে যাওয়ারর কথা ছিল। 'মহাভারত' -এ আংটির কোনো কথাই ওঠে নি। এ গল্পের দুর্বাসাও কালিদাসের গল্পই অনুসরণ করেছেন ("শকুন্তলার কথা জানা তো? কালিদাস তার নাটকে লিখেছেন")। অবশ্য কালিদাসকে না এনে দুর্বাসার উপায় ছিল না। 'মহাভারত' - এর উপাখ্যানে দুর্বাসার শাপের কথাও আসে নি। 'পরশুরাম গ্রন্থাবলী'-র ভূমিকা, ১ ২৬। এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য একটি ভালো গল্প শুনিয়েছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭ - ১৮৫৮) তখন মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; কাজের ফাঁকে কলকাতায় এসেছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ জিজ্ঞেস করলেন, "ও দেশের লোকজন কেমন? ভদ্রলোকের মতন বটে!" মদনমোহন -এর উত্তর "মহাশয়, সে কথা বলিবেন না; অধিকাংশ লোক এরূপ যে, শাঠ্য, লাম্পট্য, কাপট্য ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটি মাত্র নাই।' কৃষ্ণকমল মন্তব্য করেছেন "ফলতঃ সংস্কৃত সুদীর্ঘশব্দঘটা যেন মদনমোহনের তুণ্ডাগ্রে সর্বদা বিদ্যমান ছিল। তিনি যেন সে বিষয়ে একজন স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন' (বিপিনবিহারী গুপ্ত,

৩২)।

পরশুরামের প্রথম গল্প, "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" -এ জুডাস লেন - এর তেতলা বাড়ির বর্ণনায় এই 'বিচরণ' শব্দটিছিল "কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রম মৃগেরন্যায় নিঃশঙ্ক। সিঁড়ির যাত্রিগণকে গ্রাহ্য করে না।"